The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Special Volume-6 on **Issues Around Pedagogy: Teaching-Learning Strategies in Arts & Humanities for the 21st Century**, **3rd International Conference**, 25-26 June 2025, ISSN 1813-0402

বাংলা উপন্যাসে জেলেদের ঋণ ও মহাজন প্রসঙ্গ

[The Issue of Fishermen's Debt and Moneylenders in Bengali Novels]

Muhammad Alamgir, PhD
Professor, Department of Theatre, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Special Volume-6
ISSN: 1813-0402 (Print)
https://www.ru.ac.bd/arts/wp-content/uploads/sites/61/2025/11/51.-Muhammad-Alamgir-PhD.pdf
Received : 16 February 2025
Received in revised: 10 April 2025
Accepted: 16 March 2025
Published: 25 October 2025

Keywords:
Marginalized, Fishermen, Dept., Money loadering, Oppression, Women and loan

ABSTRACT

Since the beginning of private property accumulation, taking loans has become almost inevitable for the working-class and marginalized communities at certain stages of their lives to sustain their livelihoods. This is especially true for those communities engaged in professions inherited through generations. Marginalized communities governed by the caste system often remain unemployed for part of the year. As a result, daily wage earners have no alternative but to resort to borrowing. Notably, it is ultimately the women of the working-class society who bear the dire consequences of repaying these debts. Among the working-class communities of Bengal who become entangled in debt, the fishing community is particularly prominent. Due to natural factors in Bengal, when the water levels in rivers, canals, and wetlands decrease drastically, the majority of the fishing community members find their livelihoods disrupted because time does not stop for individuals or society. Furthermore, various factors such as disease, medical expenses, adherence to religious obligations, oppression by those in power, imposed taxes, forced donations, unpaid loans taken in the form of fish from fishermen, and the failure to repay those debts have resulted in such a heavy burden of loans on fishermen that it often remains unpaid across multiple generations. The essay, 'The Issue of Fishermen's Debt and Moneylenders in Bengali Novels' presents themes reflected in Bengali novels, including the nature of fishermen's debt, the oppression of moneylenders, the consequences for families that fail to repay loans or delay repayment, the suffering of women, and potential ways to free fishermen from this cycle of debt.

১. ভূমিকা

এই প্রবন্ধে বাংলা বলতে বৃহত্তর বাংলাভাষী অঞ্চলকে বুঝানো হয়েছে। বর্তমান বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা প্রদেশ নিয়ে এই অঞ্চল বিস্তৃত। এই অঞ্চলের বিস্তৃতি প্রায় আড়াই লক্ষ বর্গকিলোমিটার। নদীমাতৃক বাংলার মানুষের অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ নদী। কাজেই নদী ছাড়া বাংলার মানুষের জীবন অর্থহীন। বাংলা উপন্যাসে এই নদী ও নদীনির্ভর জনজীবনের প্রতিফলন ব্যাপকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। আর এই নদীনির্ভর জনজীবনের একটা অংশ মাছধরা ও মাছ বাজারজাতকরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। মাছধরা ও মাছ বাজারজাতকরণের সঙ্গে সংযুক্ত জনগোষ্ঠী তথা জেলে সম্প্রদায় অভাবহেতু নানাভাবে ঋণগ্রস্ত হয়ে ঋণদাতা মহাজনদের নাগপাশে বন্দি হয়ে পড়ে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-৫৬) 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬), অমরেন্দ্র ঘোষের (১৯০৭-৬২) 'চরকাশেম' (১৯৪৯), অদ্বৈত মল্লবর্মণের (১৯১৪-৫১) 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৫৬), সমরেশ বসুর (১৯২৪-৮৮) 'গঙ্গা' (১৯৫৭), আব্দুল জব্বারের 'ইলিশমারির চর' (১৯৬১),শামসুল হকের (১৯২৫-?) 'নদীর নাম তিসতা' (১৯৬৬), সাধন চট্টোপাধ্যায়ের (১৯৪৪-?) 'গহিন গাঙ' (১৯৮০), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৯১৭-৭০) মহানন্দা,[১] আবু ইসহাকের (১৯২৬-২০০৩) পদ্মার পলিদ্বীপ (১৯৮৬) ইত্যাদি উপন্যাসে ঋণগ্রস্ত জেলে সম্প্রদায়ের আর্থিক জীবনের নানাবিধ জটিলতা সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। বাংলা উপন্যাসের উক্ত প্রেক্ষাপটে স্বাভাবিক ভাবেই অনুসন্ধিৎসু মনে বেশ কিছু প্রশ্নের উদয় হয়। যেমন জেলেসম্প্রদায়ের অভাব কতটা তীব্র? ঋণদাতা অর্থাৎ মহাজনের সঙ্গে জেলেসম্প্রদায়ের সম্পর্ক কেমন? ঋণের সঙ্গে জেলের জাল ও নৌকা কিভাবে জড়িয়ে যায়? ঋণগ্রস্ত জেলের মাছ বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে মহাজনের ভূমিকা কী? জেলের ঋণের সঙ্গে তার নারী কিভাবে জড়িয়ে পড়ে? সমবায় সমিতির মাধ্যমে কি জেলের সম্প্রদায়কে ঋণের অভিশাপ থেকে রক্ষা করা সম্ভব? জেলের সম্প্রদায়ের ঋণ পাওয়ার নেপথ্য কারণ কী? ইত্যাদি। বাংলা উপন্যাসের গবেষণায় উক্ত বিষয় সম্পর্কে সার্বিক কোনো পর্যালোচনা পরিলক্ষিত হয় না। সংগত কারণে বিষয়টি আলোচনার অপেক্ষা রাখে এবং বাংলা উপন্যাসে যেহেতু বাংলার সমাজমানসের প্রতিফলন অবশ্যম্ভাবী সেহেতু বাংলা উপন্যাসের নিবিড় পঠন-পাঠন ও যথাযথ বিশ্লেষণের মাধ্যমে উক্ত জিজ্ঞাসাসমূহের জবাব আলোচ্য প্রবন্ধে অনুসন্ধান করা হয়েছে।

২. অভাব

বাংলা উপন্যাসে জেলেদের অভাবের তীব্রতা অত্যন্ত স্পষ্ট। 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে বলা হয়েছে পরনের ছেঁড়া কাপড় ও শীর্ণ দেহে শুষ্ক মুখে দারিদ্রের সুপরিচিত রূপ দেখেই জেলেদের সনাক্ত করা যায়। কথায় বলে অভাবে স্বভাব নষ্ট। অভাব জেলেদের কেবল স্বভাবই নষ্ট করে না—তার পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সংকট সৃষ্টি করে। উক্ত উপন্যাসে অভাবজনিত নষ্ট স্বভাবের অংশ হিসেবে ক্ষুধার তাড়নায় বাবার আদেশ পেয়েও বড়ভাই ছোট ভাইকে খাবারের অংশ না দিয়ে কলহে মেতে উঠে। ক্ষুধার যন্ত্রণা জানে বলেই গরিব গরিবকে চাল ধার দিলেও অভাবের তাড়নায় অনেকেই অশুভ দিনক্ষণের অজুহাতে ধার দিতে চায় না। প্রবল ক্ষুধা মানুষকে এতই কাবু করে ফেলে যে জমানো আসর ছেড়ে আসতে সে বাধ্য হয়। অভাবের ফলে সে বিশ্বাস ভঙ্গ করে মহাজনের অতি অল্প টাকা চুরি করে। কারণ বেশি চুরি করার সাহস তার নেই এবং তার বিবেক বড় চুরিতে তাকে বাধা দেয়। দুআনা চুরিকালে জেলের বিবেক চুপ করে থাকলেও কিঞ্চিৎ বেশি টাকা চুরিতে সে বিবেক সাঁই দেয় না এবং মহাজন নিশ্চয় জানে যে জেলে বেশি চুরি করতে পারবে না। দরিদ্রতার আর একটি খারাপ দিক এই যে, আত্মীয়-স্বজন ধার চাইলে এবং তা দিতে না পারলে সুসম্পর্কের অবনতি ঘটে। দরিদ্রতার কষাঘাত থেকে মুক্তির জন্য এমনকি জেলের মেয়ে বাবুদের রক্ষিতা/উপপত্নী হয়ে থাকে। গরিব বলেই জেলে আইনি সহায়তা পায় না। জাত ব্যবসায়ে অভাব দূর করতে না পারলে জেলে অন্য পেশার কথাও ভাবে এবং অন্য পেশায় কিছুটা পয়সার মুখ দেখলে জেলে অলস সময় পার করে। তখন তার অপমানিত জীবনের কথা বড্ড বেশি মনে পড়ে। সে রসিকতাকে সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারে না এবং নিজের স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য নারীর জন্য মন কেমন করে।[২] 'মহানন্দা' উপন্যাসে দেখা যায় জেলের স্ত্রীও কম যায় না—সে গদগদ কণ্ঠে স্বামীর কাছে সোনা রূপার অলংকার চায়। অন্যদিকে অভাবের তাড়নায় জেলে বউকে পরনের কাপড় দিতে না পারলে—যে তার বউকে কাপড় দেয়—জেলে তার মাথা ফাটায়—বউ অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে পালিয়ে যায়।[৩] অন্যদিকে 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে দেখা যায়, সংসারের সবপুরুষ নারীদের কাছে পাওয়ার জন্য পাগল হলেও জেলে সমাজে অভাব ও পণের অভিশাপে কোনো কোনো পুরুষ অবিবাহিত থাকতে বাধ্য হয়।[৪]

৩. ঋণ ও মহাজন

বাংলা উপন্যাসে অনুধাবন করা যায় জেলেদের অভাবের অন্যতম প্রধান কারণ দাদন ব্যবসা। 'চরকাশেম' উপন্যাসে বলা হয়েছে জেলেদের আসল শত্রু হলো মহাজন যারা জেলেদের দাদন দেয়।[৫] সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' উপন্যাসে দেখা যায়—'হাড়ে হাড়ে পাক দিয়ে রয়েছে মহাজনের ঋণ।' সারাবছর জেলেরা অভাবের সঙ্গে সংগ্রাম করলেও শুকনা মৌসুমে তাদের অভাব তীব্রতর হয় এবং উক্ত অভাব থেকে মুক্তির আশায় জেলে সমুদ্রে যায়। অবশ্য সমুদ্রে গিয়েও জেলের অভাব দূর হতে পারে আবার নাও হতে পারে। জেলেদের অভাবের সময়কে বলা হয় টোটা এবং বছরব্যাপী জেলের টোটার শেষ থাকে না। যেমন 'চোত পোড়া' অর্থাৎ চৈত্রের মন্বন্তর। 'চোত পোড়ার' আগে যায় পোষ পোড়া। পৌষ ও চৈত্রের মাঝে ফাল্গুনেও তেমন সুদিন আসে না। গঙ্গার মৌসুমে অর্থাৎ মাছ ধরার ভরা মৌসুমেও কখনো কখনো জেলেদের আতঙ্ক হয়ে দাঁড়ায় 'শাঙনে টোটা'। এই সব টোটায় মহাজনের কাছে বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় জেলেরা। তাই বলা হয়—জেলের জীবনে মহাজনের জাল সবসময় জড়িয়ে আছে।[৬] সঙ্গত কারণে 'গহিন গাঙ' উপন্যাসে বলা হয়েছে জেলেপাড়া মহাজনের হাতের মুঠোয় আবদ্ধ থাকে। এবং জেলেরা তাদের মাথা মহাজনের কাছে একরকম বেচে দেয়।[৭] জেলের জীবনে 'মহাজনের জালে'র স্বরূপ বাংলা উপন্যাসে বিস্তৃতভাবে উন্মোচিত হয়েছে।

'ইলিশমারির চর', 'নদীর নাম তিসতা' ইত্যাদি উপন্যাসে জানা যায় জেলেরা নৌকা, জাল, স্ত্রী পরিজনের গয়না বন্ধক রেখে ঋণ করে। এই বন্ধকী সম্পত্তি তারা আর ফিরে পায় না বললেই চলে।[৮] মাছের মৌসুম শুরুর সঙ্গে সঙ্গে জেলেরা মাস খানেকের খোরাকিসহ গঙ্গার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। খোরাকির চাল-ডাল সংগ্রহ করা হয় ঋণের মাধ্যমে। ঋণের নিয়মিত সুদের সঙ্গে বোঝার উপর শাকের আঁটির মতোই বাড়তি টাকা গুণতে হয় জেলেদের। বাজারে যে চালের দাম 'বারোর মধ্যে' মহাজন তার দাম ধরে পনের/ষোল টাকা।[৯] অতিরিক্ত তিন/চার টাকা এবং তার সুদ গুণতে হয় জেলেদের। অনেক সময় মহাজন দোকানদারও বটে এবং এই সুযোগে সে জেলেদের বাকির খাতায় টাকার অঙ্ক বাড়িয়ে দেয়।[১০]

'নদীর নাম তিসতা' উপন্যাসে দেখা যায় ঋণ পাওয়াটা প্রায় ক্ষেত্রেই মহাজনের মর্জির উপর নির্ভরশীল এবং পূর্বের ঋণ শোধ না করে নতুন ঋণ পাওয়া খুবই কঠিন।[১১] 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে দেখা যায় অসময়ে মহাজন জেলেদের ঋণ দিতে চায় না। মহাজনের মন তখন 'পাথর' হয়ে যায়। কিন্তু জেলেদের তো ঋণ ছাড়া গতি থাকে না। ঋণ গ্রহণের পর জেলেকে বাধ্য হয়ে মহাজনের কথা শুনতে হয়।[১২] 'গহিন গাঙ' উপন্যাস থেকে জানা যায় জলে তখন মাছ না থাকলে কী হবে—জেলে উসুল চায়। এই পরিস্থিতিতে জেলের বউ ছেলে মেয়ে বাড়িতে ঠিক থাকতে পারে না।[১৩] উসুল হিসাবে কখনো কখনো জেলের বউকে বিনা পারিশ্রমিকে মহাজনের বাড়ির কাজ করে দিতে হয়।[১৪] 'গঙ্গা' উপন্যাসে দেখা যায় কখনো বা সুযোগ পেয়ে মহাজন জেলের ঘরের খবর নেয়—জেলের বাড়ি গিয়ে তার বউকে কাপড় দেয় এবং বউয়ের

হাত ধরে। এ যাওয়া আসার ফল তখনই জেলেদের জন্য মারাত্মক হয়ে উঠে যখন তাদের ঘরের বৌ প্রায় স্থায়ী ভাবে মহাজনের সঙ্গে থাকতে বাধ্য হয়।[১৫] উল্টোদিকে কোনো কোনো মহাজন জেলের ছেলের সঙ্গে তার প্রতিবন্ধী

মেয়ের বিয়ে দিতে ব্যর্থ হয়ে ছেলের বাপের কাছ থেকে জাল-নৌকা কেড়ে নেয়। মেয়াদের পূর্বেই ঋণ শোধের জন্য তাগাদা দেয় এবং এক পর্যায়ে বুড়ো বয়সে খাতকের তরুণী মেয়েকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়।[১৬]

'গহিন গাঙ' উপন্যাসে বলা হয়েছে মহাজনী কারবারের প্রধান বিষয়ই হচ্ছে সুদ। তাই আসল টাকার চেয়ে সুদের প্রতি মহাজনের বেশি মায়া আর সেখানেই ঋণ গ্রহীতার মূল ভয়। অধিকাংশ জেলেই শুকনা মৌসুমে নৌকা জাল বাঁধা রাখে এবং নিশ্চিত করেই আষাঢ় মাসে ছাড়িয়ে নিতে পারে না। তারা কিছু কিছু ঋণ শোধ করলেও যা শোধ করে তার দেড়গুণ বাকি থেকে যায়।[১৭]

'গঙ্গা' উপন্যাসে দেখানো হয়েছে সুদ সবসময় আসলকে ছাড়িয়ে যেতে চায়। কাজেই জেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মহাজনকে তোষামোদ করে কিছু টাকা ঋণ নিয়ে এসে 'সুদের গভীর বন্ধনে' প্রায় চিরকালের জন্য জড়িয়ে যায়। উক্ত উপন্যাসে মাঘ মাসে পাঁচুর নৌকা বাঁধা পড়েছিল মহাজনের কাছে এবং মধ্য আষাঢ়ে পূর্বের দেনার উপরে মুচলেকা দিয়ে নৌকা নিয়ে এসেছে সে। গত পাঁচ বছর ধরে এই অবস্থা চলছে এবং প্রতি বছর নৌকা বাঁধা পড়েছে। চক্রাকারে দেনা বাড়ছে। নিরুপায় জেলেরা কখনো সুদ মওকুফের জন্য কাকুতি-মিনতি করলে সুদ তো মাফ হয় না উপরন্তু নানা অকথা কুকথা শুনতে হয় এবং মহাজন জেলেদের অক্ষমতার দিকে ইঙ্গিত করে। এমতাবস্থায় অনেকেই নিজের নৌকা নিজেই ভাড়া নিয়ে গঙ্গায় মাছ ধরতে যায়। এর ফলে মহাজন একদিকে ভাড়া পায়—অন্যদিকে তার সুদ বাড়ে। মাছধরার ভরা মৌসুমে অর্থাৎ গঙ্গার মৌসুমে মহাজন জেলেদের কাছ থেকে তার পাওনা-গণ্ডা আদায় করে নেয়। গঙ্গায় মাছ ধরার জন্য খাজনা দিতে হয় না। তাই গঙ্গায় মাছ ধরা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—ভগবতীর মিঠে জলে সুদিনের বান ডেকেছে। অবশ্য শুকনো মৌসুমে জেলের প্রায় অর্ধেক মাছ প্রতিদিন মহাজনের কাছে গেলেও তার হিসেব থাকে না। জেলেদের মহাজন পাল মশায় ভরা মৌসুমে জেলেদের নৌকায় নৌকায় ঘোরে এবং জেলের মাছ নিজেই ফড়ে পাইকেরদের ডেকে দাম-দর করে মাছ বিক্রি করে টাকা নিজের পকেটে রাখে—ঋণ আদায় করে। জেলের খাবারের টাকা না থাকলে উক্ত টাকা থেকে খাবারের টাকা দিয়ে খোটা দেয়—'কী গেলাটাই গিলতে পারো বাপু তোমরা।'[১৮]

ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মহাজনের কাছে মাছ বিক্রিতে জেলেরা বাধ্য থাকে।[১৯] 'গঙ্গা' উপন্যাস হতে জানা যায় মহাজনের অগোচরে অন্যকে মাছ দেয়া বড়ই পাপ এবং এর ফল হয় ভয়াবহ—'মহাজন নৌকাসহ জাল কেড়ে নেয়—জেলের মাছধরা বন্ধ হয়ে যায় এবং ভবিষ্যতে মহাজনের সঙ্গে জেলের লেনদেনের ক্ষেত্র ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে।' উক্ত উপন্যাসে দেখা যায় নগদ ও দুটো বেশি পয়সার নিতান্তই মানবিক প্রয়োজনে কদমে পাঁচু আতরজানকে যেন চুরি করে মাছ দেয় এবং বড় ভয়ে ভয়ে বাপ-বেটা উঁচু পাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। পরে বিষয়টি জানাজানি হলে মহাজন ব্রজেন ঠাকুর কদমে পাঁচুকে জাত তুলে গাল দেয়। অবশ্য এমনিতেই মহাজন জেলেদের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তুই তোকারি ছাড়া কথা বলে না। অবশ্য গালি-গালাজের বিপরীত চিত্রও দেখা যায়। জালে পর্যাপ্ত মাছ ধরা পড়লে মহাজন জেলেদের পিঠ চাপড়ে দেয়—টাকা গুনতে গুনতে হেসে হেসে দীর্ঘদিনের কারবারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।[২০] প্রকৃতপক্ষে মাছধরার মৌসুমটাকে যথেষ্ট চাতুর্য ও তৎপরতার সঙ্গে পাওনা আদায়ের কাজে লাগায় মহাজন। কখনো কখনো শ্রাবণে জেলেদের জীবনে নেমে আসে শাঙনে টোটা—শ্রাবণের মহামন্বন্তর। তখন জালে মাছ উঠে না এবং নৌকায় খোরাকির চাল থাকে না। অথচ পেটে তো কিছু না কিছু দিতেই হয়। কেননা জালে মাছ পড়ার সঙ্গে পেটের কোনো সম্পর্ক নেই। এমন পরিস্থিতিতে অনাহারে অর্ধাহারে জর্জরিত জেলে নিষ্ফলা পরিশ্রমে একেবারে নেতিয়ে পড়ে এবং অনিবার্যভাবে জেলেদের মধ্যে আমাশয় রোগ দেখা দেয়। এমতাবস্থায় জেলেরা জাল-নৌকা নিয়ে পালাতে চায় কিন্তু মহাজন তা হতে দেয় না। কারণ এমনও হয়েছে যে নিরুপায় মানুষ তার সব বেচে দিয়ে বউ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে চলে গেছে দূর বাদাবনে। তাই মহাজন তার খাতকদের চোখে চোখে রাখে—পালাক্রমে খাতকদের নৌকা পাহারা দেয়—যেন তারা পালাতে না পারে—তার টাকা মার না যায়। অভাবের ছোবলে জর্জরিত জেলে যখন কোনো দিশা পায় না, তখন উক্ত পাহারাদারিতে মন্ত্রের কাজ হয়—শত অসুবিধা সত্ত্বেও কাজের মাঝে থাকে। ফলে জেলেরা সামনে তাকায়। অন্যদিকে গঞ্জের চালায় আশ্রিত মহাজনের টাকা আদায় চলে—মহাজন হোটেলে খেয়ে প্রায়ই দুএকটা শখ মেটানোর জন্য শহর ঘুরে আসে—যেখানে পয়সা দিলে সব হাতের কাছে পাওয়া যায়। অবশ্য শখ মেটানোর টাকা মহাজন নিজের পকেট থেকে দেয় না—নানা ফিকিরে জেলেদের থেকে তা আদায় করে। আর গ্রামের মহাজন শহরের সবকিছুতেই মুগ্ধ হলেও নিষিদ্ধপল্লির দিকে তার টান বেশি থাকে এবং যে কদিন সে মোকামে থাকে—তার নেশা কাটতেই চায় না।[২১]

কখনো কখনো মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে নদীতে দুদল জেলের মধ্যে বড় ধরনের বিবাদ দেখা দিলে দুপারের স্থানীয় মাতব্বররা সে বিবাদের সুরাহা করে দেয়। বিশেষ করে জেলেদের মহাজনদের উক্ত মিমাংসায় ডাকা হয়—প্রায় সব জেলেই কোনো না কোনো মহাজনের দাদন নেয় বলে মহাজনরা এ ক্ষেত্রে অনেকটা মধ্যপন্থা অবলম্বন করে।[২২]

বর্ষায় মাছ ধরার মৌসুম শেষ হয়ে আসে। একে এক নৌকা চলে যায়। মহাজনও বিদায়ের আয়োজন করতে থাকে। জেলেদের সঙ্গে মহাজনের ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিবর্তন দেখা যায়। 'গঙ্গা' উপন্যাসে দেখা যায় মহাজন ব্রজেন ঠাকুর মশাইয়ের সঙ্গে কদমে জেলের তখনও হিসাব-নিকাশ না মিটলেও (এ হিসাব কখনো মিটে কি?) ঠাকুর তাকে অনেক বাবা বাছা করে। কেননা এবার কদমেরা বাপ-ব্যাটা ঠাকুরকে অনেক মাছ দিয়েছে। অবশ্য ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে উক্ত ব্যবস্থাপনা সব সময় ঠিক থাকে না। জ্বরা-মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে ঘটে নানা পরিবর্তন, নানা কৌশল। দেখা যায় অনন্ত মাঝির বয়স হলে মহাজন তার নৌকা ও বাঁধাছাঁদি জাল নিজের কাছে রেখে দেয়। কারণ অনন্ত বৃদ্ধ হয়েছ—সে যদি সামনের মৌসুমে না আসতে পারে তবে তার নৌকা ও জালে তার পাওনা টাকা শোধ হয়ে যাবে। অথচ অনন্ত জেলের জাল আর নৌকার দাম প্রায় হাজার টাকা। মহাজনের পাওনা তিনশ টাকা। সঙ্গত কারণেই জেলে আর্তনাদ করে—যদিও তাতে কোনো ফল হয় না। অনুরূপভাবে বিন্দুমাত্র সুযোসেই মহাজন তুচ্ছ দেনার দায়ে জেলেদের সর্বস্ব কেড়ে নেয়। অন্যদিকে জেলেদের আকস্মিক মৃত্যু, নৌকা বা জাল নষ্ট হয়ে যাওয়ায় অনেক সময় মহাজন কাঙ্ক্ষিত ঋণ আদায়ে সমস্যায় পড়ে। দেখা যায় সয়ারামের ভাই ঠাণ্ডারামের নৌকা জেটিতে বাড়ি খেয়ে ভেঙ্গে যায় (ঠাণ্ডারাম তার বন্ধকী নৌকাই ভাড়া নিয়ে এসেছিল) এবং ঠাণ্ডারামও মারা যায়। স্বাভাবিকভাবেই জেলেদের মধ্যে বিষাদ নেমে আসে। আর ঠাণ্ডারামের মহাজন পাল মশায়ের অভিব্যক্তিতে তখন সর্বস্ব হারানোর বেদনা ফুটে উঠেছে। বেকুফ বনে যাওয়া পাল মশাই শুকনো মুখে কেবল বলেছে 'এরা আসে বা কেন মরে বা কেন।'[২৩] অবশ্য কোনো কোনো মহাজন মৃত জেলের উত্তরাধিকাদের কাছ থেকে পাওনার অতিরিক্ত টাকাও দাবি করে।[২৪]

সাধারণভাবে মহাজন-জেলে সম্পর্ক আর দশটা মহাজনী ব্যবসার মতই ঘৃণ্য, অমানবিক। সব সময়ই মহাজন নানা অন্যায়-অবিচারের ফাঁদে জেলেদের আটকে রাখে। 'গঙ্গা' উপন্যাসে দেখা যায়—মহাজন যখন মোকামে আসে তখন খাতক জেলে নানা ভাবে তার মন রাখার চেষ্টা করে—বিনিময়ে যদিও তাকে মহাজনের খারাপ কথা শুনতে হয় ও তার অযৌক্তিক আবদার পূরণ করতে হয়। উক্ত আবদার রাখতে গিয়েই জোয়ান ছেলেদের সামনে জেলেকে শুনতে হয়—'দেখছি শালার জাত খারাপ।' এ গালি শুধু পাঁচুকে নয় সকল জেলেকে লাঞ্ছিত করে। যদিও এ অপমান ও লাঞ্ছনা পুরনো তবুও তা নতুন করে জেলের বুকে বাজে। এবং বাজে বলেই বিলাসের মত তরুণের প্রতিবাদী স্বর শোনা যায়—'অত জাত বেজাত করছেন কেন?' জেলের প্রতিবাদে হতোবাক মহাজন তার অমোঘ অস্ত্র ছাড়ে—ঋণ শোধের চাপ দেয়। জোঁকের মুখে নুন পড়ে। প্রতিবাদী স্বরের লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে—মাথা নিচু করে জেলের ছেলে স্বীকার করে নেয় যে ঋণ শোধের ক্ষমতা তার নেই।[২৫] কখনো কখনো মহাজন-জেলের বিবাদ মারাত্মক রূপ ধারণ করে। উক্ত বিবাদের ফলে গঞ্জের ঘাট বাবুর সঙ্গে যোগসাজস করে মহাজন জেলেদের মাছের দাম কমিয়ে দেয়।[২৬] 'ইলিশমারির চর' উপন্যাসে দেখা যায় প্রতিশোধ পরায়ণ মহাজন খাতকের গর্ভবতী স্ত্রীকে ভাড়াটে লোক দিয়ে ধর্ষণ ও হত্যা করে খালের পাঁকে পুঁতে দেয়।[২৭] প্রকৃতপক্ষে মহাজন নিজের ক্ষতি ছাড়া জেলেদের কোনো ক্ষতিকেই ক্ষতি বলে স্বীকার করতে চায় না। তাই দেখা যায় ঘাট থেকে শেষ লঞ্চ চলে গেলে সময়মতো মাছ চালান দিতে না পেরে মহাজন জেলেদের জাত তুলে গালি গালাজ করে।[২৮] এমনও দেখা গেছে ঝড় ইত্যাদিতে নৌকাডুবি বা অন্য কোনো ভাবে ধরা মাছের ক্ষতি হলে তার দোষ জেলেদের ঘাড়ে চাপানো হয় এবং অনুরূপ দোষে জেলেকে পিটিয়ে মেরে ফেলে তার মৃত্যুকে আমাশয় রোগে মৃত্যু বলে চালিয়ে দেওয়া হয়।[২৯]

'গঙ্গা' উপন্যাসে কিছুটা ব্যতিক্রমী দুই নারী মহাজন দামিনী ও তার নাতনী হিমি। পাঁচুর বড় ভাই, বিলাসের বাবা নিবারণ সাইদারের সঙ্গে দামিনীর ব্যক্তিগত সম্পর্কের জের ধরেই পাঁচু বিলাসের সঙ্গে ব্যবহারের ক্ষেত্রে দামিনীর স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। আর এ পথেই বিলাসের সঙ্গে হিমির সম্পর্ক নিবিড়তর হয়। ফলে মূলত ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতেই মহাজন দামিনী পাঁচু ও বিলাসকে বলতে পারে—'একে অপরের সুখ-সুবিধে দেখবে। তোমরা ছাড়া আমরা নই, আমরা ছাড়া তোমরা নও।' এই যে 'তোমরা ছাড়া আমরা নই, আমরা ছাড়া তোমরা নও'—এটিই হচ্ছে মহাজন-জেলে সর্ম্পকে শেষ ও চূড়ান্ত কথা। জেলের শ্রমের অর্থেই মহাজনের ধনভাণ্ডার স্ফীত হয় এবং এ বিষয়টি জেলেরাও ভালো ভাবে উপলব্ধি করতে পারে। মহাজন ঋণ দিয়ে শোধ নেবে কাকা পাঁচুর এই যুক্তির বিরুদ্ধে ভাইপো তরুণ বিলাসের প্রতিবাদ শোনা যায়। মহাজন-জেলের সর্ম্পকের মূল তত্ত্বটি উপলব্ধি করতে পেরে বিলাস বলে—'তার চে' ঋণ নেব না। আমাকে ঋণ দে' তো মহাজন খায়। আমি যদি ঋণ না নে' না খেয়ে মরি, মহাজনে বাঁচে কেমনে? ঋণের জোরেই তো?'[৩০] কিন্তু দুর্ভাগ্য জেলেদের—প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা এবং উপাদানের অভাবে তারা উপলব্ধ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি। আর তাই মহাজন-জেলে সম্পর্ক গঙ্গা যমুনার বহমান জলধারার মতই অবিচ্ছিন্ন। তাই জেলে মহাজনকে 'মাছ, টাকা, মান, ইজ্জৎ, মায় জীবন পর্যন্ত' দিয়ে দিতে বাধ্য থাকে।[৩১] সর্বনাশা দাদনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য জেলেদের সমবায় সমিতির কোনো বিকল্প নেই। দুএকটি উপন্যাসে দেখা যায় চরে বসতি স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও খাদ্যের যোগান দিতে গিয়ে লোকজন প্রাথমিকভাবে সমবেত প্রচেষ্টায় মাছ ধরা ও বিক্রয় শুরু করে।[৩২]

'ইলিশমারির চর' উপন্যাসে দেখা যায় মাছ বিক্রির টাকার সঠিক ভাগ পাওয়ার জন্য নৌকার শ্রমিকরা ধর্মঘটের চিন্তা করেছে এবং যথারীতি ধর্মঘট আহবান করেছে। ধর্মঘট চলাকালে তারা জেলেদের সাময়িক খারাপ অবস্থার বিষয়ে সচেতন হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত সাফল্য লাভ করেছে।[৩৩]

বাংলা উপন্যাসে দেখা যায় জেলেরা নিজে সমবায় সমিতি করে বা অন্য সমিতি থেকে সুযোগ নিয়ে যে সব সময় লাভবান হয়েছে এমন কিন্তু নয়। 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে দেখা যায় 'সমবায় ঋণদান সমিতির ফিসারী শাখা' হতে জেলেরা ঋণ নেয়ার সময় মাছের টোপ গেলার মতোই টোপ গিলেছে এবং সময়মতো তা উগলে দিতে পারেনি। সুদ কম বলে লোভে পড়ে ধার করা টাকা এখন চক্রবৃদ্ধি হারে বেশ স্ফীত হয়েছে। পরবর্তীকালে সুযোগ বুঝে সমিতির কর্মকর্তারা জেলেদের প্রায় নিঃস্ব করে সবকিছু নিয়ে গেলে তারা এভাবে সান্ত্বনা পেতে চায় যে ভাগ্যের উপরে কোনো হাত নেই এবং জেলেদের প্রতিবেশীরাও তাদের এই বলে আশ্বস্ত করে যে সব গেলেও তাদের নৌকা তো রয়েছে।[৩৪] 'গহীন গাঙ' উপন্যাসে দেখা যায় মহাজনদের সঙ্গে গঞ্জের ঘাট বাবুদের ষড়যন্ত্রের ফলে সমবায়ের প্রচুর মাছ পচে 'গোবর' হয়ে যায়। তাদের ষড়যন্ত্রে তিন দিন ঘাট বন্ধ থাকায় সমবায় সমিতির হাজার হাজার টাকা নষ্ট হয় এবং তাদের কৌশলে সমবায় সমিতির শেষ ঘণ্টা প্রায় বেজে যায়। এতৎসত্ত্বেও অভিজ্ঞজন মনে করে সমবায় করতে গিয়ে ভুলভ্রান্তি যাই হোক না কেন তার মূলে অর্থাৎ জেলেদের কল্যাণের ভাবনার মধ্যে কোনো ফাঁক ছিল না। সমবায় সমিতি নিয়ে কেউ রাজনীতি করতে চাইলে জেলেদের নিজেদেরই তা পরিচালনা করা প্রয়োজন। মনে রাখা দরকার 'কেউ কাউকে বাঁচায় না, নিজেদের বাঁচতে হয়।' সমবায় সমিতি নষ্টের মূলে জেলেদের দায়ও একেবারে কম নয়। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে জেলেরা সব চেয়ে নিপীড়িত অথচ সুযোগ সন্ধানী। তারা সমবায়ের সুবিধাটুকু নেবে কিন্তু বেকায়দা দেখলেই সমবায় ছেড়ে চলে যাবে। তারা সমবণ্টন মানতে না পেরে মহাজনের কাছে দাদন নিয়ে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনলেও সমবায় সমিতির সামান্য অসুবিধাটুকু মানতে একেবারেই নারাজ। অন্যদিকে জেলেরা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে আর শোধ দিতেও চায় না যা সমিতি ধ্বংসেরই নামান্তর মাত্র।[৩৫]

৪. উপসংহার

জলাশয়ে মাছ না থাকা এবং মহাজনের অসাধুতাই জেলে সম্প্রদায়ের জীবনে অভাবের তীব্রতম কারণ। অবশ্য জলাশয়ে যখন পর্যাপ্ত মাছ থাকে তখন মহাজনের অসাধুতা সত্যেও জেলে তার দুর্দিন পার করতে পারে। কিন্তু জেলে জলাশয়ে সুদিন না পেলে কোনোভাবেই মহাজনের খপ্পর থেকে বের হতে পারে না। সে তার বন্ধকি সম্পত্তি ঘরে আনতে না পেরে অল্প দামে হাতছাড়া করতে বাধ্য হয়। মহাজন বেকায়দায় ফেলে নিজের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন সন্তানের সঙ্গে জেলে পরিবারের সক্ষম সন্তানের বিয়ে দিতে চায়, মহাজন নিজেই জেলের কণ্যাকে অসম বিয়ের প্রস্তাব দেয়, এমনকি কখনো কখনো মহাজন জেলের নারীকে নিজের ঘরে রাখে। ঋণ আদায়ের উদ্দেশ্যে মহাজন জেলের নৌকা জাল কুক্ষিগত করার জন্য এমনকি জেলেকে হত্যা করে অপমৃত্যু বলে চালিয়ে দিতে দ্বিধা করে না। বহুক্ষেত্রে জেলের শহরমুখী অভিবাসনের পশ্চাতে ঋণের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সমবায় সমিতির মাধ্যমে ঋণ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও ব্যবস্থাপক নিজেকে মালিক পক্ষ বিবেচনা করে এবং জেলেরাও নিজেদের প্রজা হিসেবে ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে সমবায়ের সুফল কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় পৌঁছে না। তা সত্ত্বেও সমবায় এবং সরকারি ঋণের সুব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জেলেদের আর্থিক জীবনের উন্নয়ন সম্ভবপর হতে পারে এবং এ বিষয়ে সরকারের সুদৃষ্টি প্রয়োজন।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মহানন্দা, *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, *দ্বিতীয় খণ্ড*, *আশা দেবী ও অরিজিৎ* গঙ্গোপাধ্যায় *সম্পা.* (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা.লি., ১৯৯০)। এই গ্রন্থের গ্রন্থ পরিচিতি অংশে (পৃ. ৪৪০) জানা যায়, মহানন্দা উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ডি.এম. লাইব্রেরি থেকে, যেখানে প্রকাশকাল নেই। তবে অন্যতম সম্পাদক আশা দেবী মনে করেন উপন্যাসটি ১৯৫৫ সালে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়, যদিও তিনি পত্রিকার নাম উল্লেখ করেননি। পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৭৭ সালে পাত্র পাবলিকেশন থেকে উপন্যাসটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

২ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মানদীর মাঝি, *মানিক গ্রন্থাবলী*, প্রথম খণ্ড (ষষ্ঠ সংস্করণ; কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রা.লি.,১৯৮৬), পৃ. ১৩-১৪, ২১, ২৭, ৩৭-৩৮, ৫৪, ৫৯, ৬২, ৭২ ও ৯০।

৩ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মহানন্দা, *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, *দ্বিতীয় খণ্ড* (কলকাতা; মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা.লি., ১৯৯০) , পৃ. ১৬৮।

৪ অদ্বৈত মল্লবর্মণ, *তিতাস একটি নদীর নাম (কলকাতা: পুথিঘর, ১৯৯)*, পৃ. ৩০১।

৫ অমরেন্দ্র ঘোষ, *চরকাশেম (*কলকাতা: *সারস্বত লাইব্রেরী*, *১৯৮৬)*, পৃ. ১০১।

৬ সমরেশ বসু, *গঙ্গা*, সমরেশ বসু, *গঙ্গা*, সমরেশ বসু রচনাবলী ২, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা. (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি., ১৯৯৮), পৃ. ২০৫ ও ২৫১।

৭ সাধন চট্টোপাধ্যায়, *গহিন গাঙ* (কলকাতা: ক্রান্ত্রিক প্রকাশনী, ১৯৮০), পৃ. ৩৭ ও ৫৯।

৮ আবদুল জব্বার, *ইলিশমারির চর* (কলকাতা: ইউনিভারর্সাল বুক ডিপো, ১৯৬১), পৃ. ২২-২৩। শামসুল হক, *নদীর নাম তিসতা* (ঢাকা: ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, *১৯৬৬)*, পৃ. ৪, ১১।

[৯] সমরেশ বসু, *গঙ্গা*, পৃ. ২২৯-৩০।
[১০] আবদুল জব্বার, *ইলিশমারির চর*, পৃ. ৭৩-৭৪।
[১১] শামসুল হক, *নদীর নাম তিসতা*, পৃ. ৯০।
[১২] অদ্বৈত মল্লবর্মণ, *তিতাস একটি নদীর নাম*, পৃ. ৩০১।
[১৩] সাধন চট্টোপাধ্যায়, *গহিন গাঙ*, পৃ. ২১।
[৪] আবদুল জব্বার, *ইলিশমারির চর*, পৃ. ১৫।
[৫] সমরেশ বসু, *গঙ্গা*, পৃ. ২৩৪ ও ৩২১।
[৬] শামসুল হক, *নদীর নাম তিসতা*, পৃ. ১৭-২৭ ও ১১৩।
[৭] সাধন চট্টোপাধ্যায়, *গহিন গাঙ*, পৃ. ২৩।
[৮] সমরেশ বসু, *গঙ্গা*, পৃ. ২২৪-৩১, ২৫৯ ও ২৮৯।
[১৯] আবদুল জব্বার, *ইলিশমারির চর*, পৃ. ৩৮। আবু ইসহাক, *পদ্মার পলিদ্বীপ (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৮৬)*, পৃ. ১৬৬। দাদন নেওয়া জেলেরা মাছ বিক্রির সময় ১০ শতাংশ ও আর দাদন ছাড়া জেলেরা ৫ শতাংশ হারে আড়তদারকে কমিশন দিয়ে থাকেন। ইকরামুল আলম, দাদনের জালে বন্দি জীবন, দৈনিক কালের কণ্ঠ, ২৭শে মে ২০২৫, পৃ. ১১।
[২০] সমরেশ বসু, *গঙ্গা*, পৃ. ২৭৯-৮২।
[২১] তদেব, পৃ. ৭, ২৩০ ও ২৮৯।
[২২] তদেব, পৃ. ৩০৩।
[২৩] তদেব, পৃ. ৭, ২২৮, ২৯৭ ও ৩১৬।
[২৪] সাধন চট্টোপাধ্যায়, *গহিন গাঙ*, পৃ. ৫৩।
[২৫] সমরেশ বসু, *গঙ্গা*, পৃ. ২৫৪ ও ২৮২।
[২৬] সাধন চট্টোপাধ্যায়, *গহিন গাঙ*, পৃ. ২৯।
[২৭] আবদুল জব্বার, *ইলিশমারির চর*, পৃ. ১৭১-৭২।
[২৮] সাধন চট্টোপাধ্যায়, *গহিন গাঙ*, পৃ. ২৮।
[২৯] আবদুল জব্বার, *ইলিশমারির চর*, পৃ. ১৫৮-৫৯।
[৩০] সমরেশ বসু, *গঙ্গা*, পৃ. ২২৫-২৯।
[৩১] আবদুল জব্বার, *ইলিশমারির চর*, পৃ. ৩।
[৩২] অমরেন্দ্র ঘোষ, *চরকাশেম*, পৃ. ৯৫-৯৬। আবু ইসহাক, *পদ্মার পলিদ্বীপ*, পৃ. ৫১-৫৫।
[৩৩] আবদুল জব্বার, *ইলিশমারির চর*, পৃ. ৯৬, ১০১, ১১৬ ও ১৩১।
[৩৪] অদ্বৈত মল্লবর্মণ, *তিতাস একটি নদীর নাম*, পৃ. ৩২৬-২৭।
[৩৫] সাধন চট্টোপাধ্যায়, *গহিন গাঙ*, পৃ. ২৮, ৪৯ ও ৮১। ২০১৪ সালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সংখ্যা ২০টি এবং প্রাথমিক মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল ১০৮২টি। *মীনপোষ (কলকাতা: ২০১৫)*, পৃ. ২৯। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার জেলেদের ঋণ প্রদান বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়ার কথা ভাবছেন। ইকরামুল আলম, দাদনের জালে বন্দি জীবন, পৃ. ১১।

[*] The Fourth Primary Education Development Program 2018–2023 (PEDP4)